কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে নারী শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

ড. শামীমা নাছরিন*

Abstract : There is no doubt that Buddhist philosophy places enormous importance on women's education. Not only has that it also cared deeply about women's rights. In this philosophy, there is no gender discrimination in the field of education. It has kept the path of spiritual knowledge and liberation open for both men and women. Everyone has an equal right to enter this world of knowledge. This philosophy has not created any barriers for women to enter the monastic life but has rather allowed it. At the same time, it has created opportunities for them to participate in religious activities. This approach has created a natural course for their educational life. This philosophy has vigilantly monitored women's education and their acquisition of knowledge. It has opened the way for women to acquire knowledge and has called on everyone. Religion has played a responsible role in establishing equal rights for men and women. Again, the essence of Buddhism is to attain *Nibbāna*, which is open to both men and women. Besides, some Buddhist philosophical texts have given great importance to higher education for women. In this context, the book '*Therīgāthā*' can be mentioned in particular, where various aspects of women's spiritual development have been discussed. At the same time, the book presents deep, theoretical and philosophical explanations on various aspects of women's lives. This can be identified as exemplary and followable for women's education. Again, the Mahayana texts also declare the ideal of gender equality, which has attracted everyone's attention. The article discusses the importance of women's education, which has occupied a particularly important place for women in the history of Buddhism. It also highlights the continuity of women's success from the Buddhist era to the present day. Furthermore, women's efforts, pursuits, and activities in Buddhism extend beyond the realm of knowledge and thought. The various responsibilities and contributions that women are performing and contributing to in the social and state spheres are also presented with great importance.

১. ভূমিকা

শিক্ষাই হলো জাতির আত্মপরিচয়ের বাহন। জাতিকে বিশ্ব দরবারে উন্নত মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কেননা একমাত্র শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ কুসংস্কার, জড়তা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে জাতিকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে পারে। আর যেখানে শিক্ষা নেই সেখানে জীবনের কোনো অগ্রগতি নেই। জাতীয় অগ্রগতি হয়ে পড়ে পঙ্গু ও স্থবির। ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মেরুদণ্ড যেমন মানবদেহের অপরিহার্য অঙ্গ তেমনি জাতির

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অস্তিত্বের প্রশ্নে শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষা হচ্ছে অজ্ঞতার ওপর আলোকবিন্দু। কেননা দিনে দিনে শিক্ষার পরিবেশ প্রশস্ত হচ্ছে এবং সেই সাথে দেশ হচ্ছে আলোকিত। ভারতীয় শিক্ষাজগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন সর্বমানবের কল্যাণকামী গৌতম বুদ্ধ। তিনি ধর্মজগতের সাথে শিক্ষাজগতেও আনলেন যুগান্তকারী বিপ্লব। মঙ্গলসূত্রে শিক্ষা সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, 'বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্প শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলাই হচ্ছে উত্তম (মেত্তা বংশ, ২০০৩: ১৩৯)।' আলোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধের সময়ে এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের আলোকে নারী শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিলো তা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবদানও স্বীকৃতি প্রদান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো তিনটি। যথা: ১. বুদ্ধের সময়কালীন ও পরবর্তীকালের নারীদের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান; ২. বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের আলোকে 'নারী শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও ধারণা' ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা এবং ৩. শিক্ষায় নারীর সাফল্যতার ধারণা প্রদান এবং জাতির উন্নয়নে তাঁদের অবদান উপস্থাপন।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে 'নারী শিক্ষা' এমন নামে কিছু কাজ হলেও গবেষণামূলক কাজ খুব বেশি চোখে পড়ে না। ঠিক একইভাবে নারী শিক্ষার উপরে তেমন বিশেষ কোনো কাজ হয়নি তাও বলা যায়। তবুও এই সম্পর্কিত যে ধরনের কাজ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: *থেরী গাথা* (বেলু রানী বড়ুয়া, ২০০৪) গ্রন্থে তিয়াত্তর জন থেরীর ৫২২টি গাথার মাধ্যমে তাঁদের জীবনের নানা দার্শনিক ও অভিজ্ঞতা আলোচিত হয়েছে। *বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী* (মহাস্থবির শীলালঙ্কার, ১৯৯৮) গ্রন্থে তৎকালীন নারীদের জীবনের নানা দিক বর্ণিত হয়েছে। *জাতক, প্রথম/তৃতীয় খণ্ড/ষষ্ঠ* (ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ১৪২২) গ্রন্থে কিছু কিছু জাতকে নারী জীবনের কাহিনী ও নারী শিক্ষা প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *থেরী গাথা* (ভিক্ষু শীলভদ্র, ১৩৫৭) গ্রন্থেও নারী জীবনের নানা শিক্ষা ও ঘটনা এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে 'নারী শিক্ষা' নিয়ে এককভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও একাডেমিক গবেষণার বেশ অভাব রয়েছে। সুতরাং আলোচ্য গবেষণাটির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে মূলত কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতিতে (Qualitative Method) এবং কন্টেন্ট বিশ্লেষণ (Content Analysis) এর উপর নির্ভর করে। এ জন্য প্রাথমিক ও দ্বৈতায়িক উৎসসমূহ (Praimary and Secondary sources) ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধে গবেষণার সুনির্দিষ্ট নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে ত্রিপিটক গ্রন্থ এবং মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় প্রকার উপাত্ত হিসেবে অভিধান, জাতক, পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎসসমূহ থেকে সংগৃহীত উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

৫. নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা মানুষের সবদিকেই বিস্তৃত থাকে। যেমন- জ্ঞান, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদি। ন্যায়-অন্যায়, কুশল-অকুশল, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম। শিক্ষা হলো জাতির মেরুদণ্ড, উত্থান-পতনের মানদণ্ড এবং মানুষের প্রাণশক্তি। মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলির সঞ্চার করে। বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মে কোনো জাত বা বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। বৌদ্ধ সংঘে সকল শ্রেণির মানুষের প্রবেশের অধিকার ছিলো। মানুষ তার কর্মের দ্বারাই এগিয়ে যায়। তৎকালীন সমাজে বর্ণবৈষম্যের কারণে নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। গৌতম বুদ্ধই প্রথম সে বঞ্চনা ও বৈষ্যম্য থেকে সকলকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পালি সাহিত্যে ধম্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, জটা, গোত্র কিংবা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর অন্তরে সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ (সুকোমল ও রেবতপ্রিয়, ১৯৯৭: ১২৮)। আভিজাত্যে বা বংশ পরিচয়ে মানুষের মর্যাদা বাড়ে না, মহৎ গুণাবলির জন্যই মানুষ প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হয়। সেজন্য কর্ম জীবনে তার ভূমিকা ও অবদানের দায় তার নিজের উপর বর্তায়। তাই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত বিচারে বংশ পরিচয় তেমন গুরুত্ব বহন করে না। কেননা সদবংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি অপকর্মে লিপ্ত থাকে তবে কেউ তাকে শ্রদ্ধা করবে না। অপরদিকে, একজন নীচু কুলে জন্মগ্রহণ করেও তার কর্তব্য কর্ম ও চারিত্রিক আদর্শের জন্য সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে। বৌদ্ধধর্মে এরূপ ধ্যান-ধারণা জাতি ও গোষ্ঠী বৈষম্যের ধারণা প্রশমনের অনুকূলে ছিলো। এই জন্য সমাজ পরিত্যক্ত লোকও আত্মোন্নতির পথ দেখেছিলো। নারীরাও কম এগিয়ে ছিলেন না বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র আরাম (বিদ্যালয়) ছিলো। এখানে তাঁরা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ পেতেন। শিক্ষা মানুষের জীবনের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করে জীবনকে করে তোলে মহিয়ান। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের চিন্তা চেতনাকে পরিচালিত করা, দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করা। এছাড়াও মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানব শিশু সামাজিক মানুষে পরিণত হয়ে থাকে। তাই যুগ যুগ ধরে শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কেননা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই শারীরিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক ও চারিত্রিক প্রভৃতি দিকের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

৬. বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে নারী শিক্ষা

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে নারীদের নানা রকম ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারীরা সেই সময় শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং সমাজ ও জাতি গঠনে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেছেন। নিম্নে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে নারী শিক্ষার নানা দিক উপস্থাপন করা হলো। তবে এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থের আলোকেই তা উপস্থাপন করা হয়েছে। যথা:

৬.১. বৌদ্ধ '*জাতক সাহিত্যে*' নারী শিক্ষা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যথার্থই বলেছেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো (*Napoleon Bonaparte, http://bani.com.bd/226/2718/*)।" সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ নারীদের শিক্ষা বিষয়ক অনেক তথ্য সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। তবে তারা কোথায় পড়ালেখা করেছেন সে বিষয়ে কোনো আভাস বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু জাতক সাহিত্যে শিক্ষিত নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আত্মবিশ্বাস ও যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকলে মানুষের জীবনে সকল গুণের বিকাশ ও

পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হতে পারে আর বৌদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা আত্মপরিচয় ও আত্মোপলব্ধি লাভের সুযোগ করে দেয়। আর শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে। যেমন, মিথিলা নগরের রাজা অঙ্গতির কন্যা রুজা নাম্নী তার পিতাকে বলেন, নগ্ন, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ আজীবকের কথা বিশ্বাস করবেন না; ইহলোক আছে, পরলোক আছে; সুকৃতির দুষ্কৃতির ফলও আছে। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করি; আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনি অঘাটে লম্ফ দিয়ে পড়বেন না (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২: ১৩৫)। অন্যায়কারী এবং মিথ্যাভাষণকারী এদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য রুজা নাম্নী তার পিতাকে নির্দেশ করেছেন। কেননা ভালো-মন্দ কাজের ফল বিদ্যমান আছে। তাই প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ন্যায়বোধের প্রকাশ বিদ্যমান থাকুক। অনেক সময় ভীতি ও দুর্বলতার কারণে মানুষ ন্যায়ের অমোঘ নির্দেশ পালনে পশ্চাৎপদ হয় দায়িত্ব পালনে হয় কুণ্ঠিত। তাই মুষ্টিমেয় মানুষের অপরাধের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের রয়েছে অন্যায়কে মানিয়ে চলার মানসিকতা। এই মানসিকতায় কতটুকু ক্ষমাশীলতা, ঔদার্য ও সহনশক্তি তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। মানুষ শুধু তিতিক্ষা ও করুণার কারণেই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে না তার এই মনস্তত্ত্বের নেপথ্যে রয়েছে এক আত্ম পলায়নী মনোভাব। নিজেকে অপরাধীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু তা প্রকৃত সমাধান নয়। এতে করে অন্যায়কারীরা আরো অন্যায় করার সাহস পায় এবং পৃথিবী থেকে ন্যায়বোধ ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়। তাই আমাদের অন্যায় কাজে অন্যায়কারীকে সহায়তা করা উচিত নয়।

প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কিছু গুণ রয়েছে যা তার সৌন্দর্যে ফুটে উঠে। প্রতিটি মানুষ নিজেকে ফুটিয়ে তোলে পরিবেশের নির্দিষ্টতার উপর সেখানেই তাকে সুন্দর ও সাবলীল দেখায়। যেটা আমরা 'মহা উন্মার্গ জাতকে' দেখতে পাই, অমরাদেবীর প্রায়োগিক সুতীক্ষ্ণা (অতিশয় ধারালো) বুদ্ধি-নৈপুণ্য ও বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান খুব সুন্দর ও সাবলীলভাবে যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, মিথিলারাজের সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ্র ও দেবেন্দ্র নামে এই চার পণ্ডিত তার ধর্ম অনুশাসনের কাজ করতেন। রাজা তার নিজের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমতী স্ত্রী ঘরে আনলেন। কিন্তু মহৌষধ ও স্ত্রী অমরার মন ভাঙ্গার জন্য একদা তারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। উপায়গুলো হলো, নিজেরাই রাজপ্রাসাদ থেকে রাজার চূড়ামণি, সোনার মালা, কম্বল আর সুবর্ণ পাদুকা এই চারটি জিনিস অপহরণ করে প্রত্যেকের নিজের দাসীর মাধ্যমে অমরাদেবীর কাছে পাঠিয়ে দেন। বুদ্ধিমতী অমরা সবকিছুই গ্রহণ করলেন এবং একটি পত্রে প্রতিদিন যে দাসী যা কিছু এনেছিল তার নামসহ সমস্তই লিখে রাখলেন। এই লিখিত পত্রের সাহায্যেই অমরা শেষ পর্যন্ত রাজসমীপে এদের অপহরণের বিষয় প্রমাণ করলেন (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২: ২০৫)।

এছাড়াও পরিবার, সমাজ বা জাতির উন্নতির জন্য পুরুষের সাথে সাথে নারীরও যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা আমরা প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতক সাহিত্যেও দেখতে পাই। কেননা একের দানে অন্যে পরিপুষ্ট। সেটা সৃষ্টির প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত মানব সভ্যতার যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তা নারী পুরুষ উভয়েরই যৌথ প্রচেষ্টার ফল। সৌবীর দেশে রৌরব নগরের রাজা ভরতের স্ত্রী সমুদ্রবিজয়া নাম্নী ছিলেন অত্যন্ত সুপণ্ডিতা ও জ্ঞানবতী মহিষী। এই অগ্রমহিষী তার স্বামীকে রাজধর্ম পালনের সময় বিভিন্ন কাজে সদুপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন (ঈশানচন্দ্র, ১৪২২: ২৬৭)।

কোশলরাজ কর্তৃক বারাণসীরাজ্যের রাজার মৃত্যুর পর রাজকুমার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। রাজকুমার ইতঃপূর্বে তক্ষশিলায় সর্ববিদ্যা পারদর্শী হয়েছিলেন। রাজকুমার যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন তার গর্ভধারিণী মাতা গোপনে পত্র লিখে পাঠালেন, 'যুদ্ধের প্রয়োজন নেই; বারাণসী বেষ্টনপূর্বক সবদিকে সঞ্চরণ পথ রুদ্ধ করো, তাহলে ইন্ধন, খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে নগরবাসীরা ক্লিষ্ট হবে, তুমি

বিনা যুদ্ধেই নগর অধিকার করতে পারবে।' মাতার পরামর্শমত কুমার সপ্তাহকাল যুদ্ধের পরিবর্তে নগর অবরোধ করে রাখলেন। বিনা যুদ্ধেই তিনি রাজ্যগ্রহণ করলেন (ঈশানচন্দ্র, ১৪১৯: ১৮১)।

শিক্ষা মানুষকে উচ্চস্তরের নৈতিকতা ও মানসিক গুণাবলির উন্মেষ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনসহ মানুষকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক হতে হবে তা কিন্তু নয়। পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে যেটা প্রাপ্ত সেটাও জ্ঞান। পরিবেশ-প্রতিবেশ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের কাজে লাগাতে হবে। জ্ঞান মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটায়। আর জ্ঞান ছাড়া মানবিকতার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। বৌদ্ধ নারীগণের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য না পাওয়া গেলেও তারা পরিবার থেকে যে শিক্ষা পেয়েছেন সেটা পরবর্তীতে আমরা দেখতে পেয়েছি। রাজ্য শাসনে পিতা, পুত্র ও স্বামীদেরকে রাজনৈতিকভাবে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পেরেছেন। রাজাদেরকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাদের পাশে থেকে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নারী তার ভেতরের প্রকৃতি প্রদত্ত সুপ্ত চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে শিখেছে। কেননা সে তার চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে নারীর চিন্তাগত মান বৃদ্ধির জন্য সব রকমের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার অন্তর্গত যোগ্যতাকেও উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছে। নারী যাতে তার ভেতরের প্রকৃতি প্রদত্ত সুপ্ত চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারে।

৬.২. **'*থেরীগাথা*'*র* আলোকে নারী** শিক্ষা

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকের খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ হলো 'থেরীগাথা'। পালি 'থেরী' শব্দের অর্থ স্থবিরী। যিনি বয়োবৃদ্ধা ও জ্ঞানবৃদ্ধা তাকেই 'থেরী' বলা হয়। এই গ্রন্থে তিয়াত্তরজন বৌদ্ধ থেরীর জীবনগাথা সংকলিত হয়েছে। তাঁদের জীবন নিয়ে রচিত গাথা মোট ৫২২টি। তাঁদের মধ্যে রাজপরিবারের কন্যা ও বধু ২৩ জন, শ্রেষ্ঠী বা ধনী সম্প্রদায়ের ১৩ জন, ব্রাহ্মণ ও পূজারীর সংখ্যা ৭ জন, বারবণিতা ছিলেন ১৫ জন। অবশিষ্ট ভিক্ষুণীরা সমাজের সাধারণ পরিবারভুক্ত গৃহস্থের মেয়ে। বৌদ্ধধর্মে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তখনকার সময়ে নারীদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো স্বাধীনতা ছিল না। বুদ্ধ স্বয়ং নারীদের সমঅধিকারের কথা বলেন (সুকোমল, ১৯৯৮: ৮০)। বলা হয়েছে, তখনকার সময়ে ছেলে শিশুর জন্মকে মেয়ে শিশুর জন্ম থেকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হতো। বুদ্ধ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে হীনমন্যতা হিসেবে অভিহিত করেন। এছাড়াও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগণ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। নারী যে একটি পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলে তার প্রভাব কিন্তু সমাজেও পড়ে। এক্ষেত্রে সংযুক্ত নিকায়ের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, একজন মেয়ে অনেকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে। তিনি মেধাবিনী, শীলবতী, শ্বশুর-শাশুড়ি সেবী, পতিব্রতা হয়ে নিজেকে গড়ে তুলে সুন্দরভাবে নিজের সন্তানকেও গড়ে তুলে এবং এরকম ভাগ্যবতীর পুত্র সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করে (সুকোমল, ১৯৯৮: ৮০)।

নারীরা আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা করেছিলেন এবং ফল লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, ধর্মদিন্না, ভদ্রকপিলানী, উৎপলবর্ণার নাম উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধিপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন উৎপলবর্ণা। মগধের রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি লাভে সর্বপ্রধানরূপে স্বীকৃত হন। এছাড়াও অনোপমা ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করে সাতদিনের মধ্যে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। থেরীগাথা গ্রন্থে আমরা বহু আদর্শ ও ধর্মপরায়না নারীর পরিচয় পাই। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে তারা মুক্তির পথে এগিয়েছিলেন। নারীরাও যে পুরুষের মতো আধ্যাত্মিক উন্নতি

করতে সমর্থ তার প্রমাণ '*থেরীগাথা*' গ্রন্থ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তারাও ধ্যান ও জ্ঞানচর্চার অধিকার পেয়েছিলো। নারীরা শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতিতে নয় তারা অর্হৎ হতে পারে। এছাড়াও নির্বাণ লাভের জন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নিম্নে কয়েকজন থেরী কোন কোন অবস্থায় থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তা তুলে ধরা হলো (শীলভদ্র, ১৩৫৭: ১৬, ১৮, ১০৩, ৭১, ৬৫, ১২১, ১৫৯, ৫৯, ১৪, ৩৩)।

ক্রমিক নং	নাম	প্রব্রজ্যা গ্রহণের কারণ
১	নন্দা	বিবাহের পূর্বক্ষণেই স্বামী মারা যায় আর বিবাহ হলো না, তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
২	সুমঙ্গলা	স্বামীর অত্যাচারে অস্থির থাকতে হতো বিধায় সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
৩	কিশা গৌতমী	স্বামী পুত্রের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে প্রব্রজিত হয়।
৪	ছন্দা	দরিদ্র, সর্বস্বহীনা, নিঃসহায়, তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
৫	পটাচারা	দুইপুত্র, স্বামী, পিতা-মাতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে গভীর শোকগ্রস্ত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
৬	রোহিনী	সাংসারিক ভোগসুখে বিতৃষ্ণা, তাই সংসার ত্যাগ।
৭	সুমেধা	রাজপুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পিতা-মাতাকে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করা।
৮	ভদ্দাকুণ্ডলকেশা	আত্মরক্ষার জন্য স্বামীকে হত্যা এবং পরবর্তীতে স্বীয় কর্মের অনুশোচনায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
৯	ধর্মা	উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিবাহ হয় কিন্তু সংসারের প্রতি আসক্তি ছিল না, তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ।
১০	উব্বরী	একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়, ধৈর্য হারায়, তাই প্রব্রজ্যা গ্রহণ।

এছাড়াও বহু নারীর নাম পাওয়া যায় যারা বুদ্ধের উপাসিকা ছিলেন এবং তাদের স্বামীরা তাদের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তারা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মহিষী মল্লিকা দেবীর মাধ্যমে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নেন। একইভাবে শ্যামাবতীর একান্ত ইচ্ছায় এবং অনুপ্রেরণায় তার স্বামী রাজা উদয়ন বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নেন। আবার তার বিপরীত চিত্রও দেখা যায় রাজার অনুপ্রেরণায় রাণী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে শ্রেষ্ঠ উপাসিকা হন। তার নাম ক্ষেমা। তিনি মগধের রাজা বিম্বিসারের পত্নী। বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও তিনি ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও শাক্যবংশের অনেক সম্ভ্রান্ত নারী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: মহাপ্রজাপতি গৌতমী (ভিক্ষুণীসংঘের প্রবর্তক), সুন্দরী নন্দা, মেত্তা ও রাহুলমাতা গোপা। অনন্য গুণসমৃদ্ধ বৌদ্ধ নারীকুলের রত্ন গৌতম বুদ্ধের প্রধান দায়িকা, উপাসিকা এবং আর্য শ্রাবিকা ছিলেন বিশাখা। তার জীবন ইতিহাস ছিলো হৃদয়গ্রাহী এবং আদর্শ স্থানীয়। বৌদ্ধযুগের বহু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ নর-নারীর মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, ধর্মপরায়ন তেমনি ছিলেন যুক্তিবাদী। পুত্রবধুর পাণ্ডিত্য দেখে শ্রেষ্ঠী মিগার (শ্বশুর) তাকে মা বলে সম্বোধন করেন। সেই থেকে তিনি মিগারমাতা নামেও পরিচিত হন। সারাজীবন বৌদ্ধধর্ম ও সংঘের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুসংঘকে দান করেন। পালি সাহিত্যের ইতিহাসে একজন প্রখ্যাত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ উপাসিকা হিসেবে বিশ্বের পণ্ডিত

সমাজ তথা বৌদ্ধ সমাজে সুপরিচিত। বৌদ্ধ সংঘের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা, ভক্তি তার জীবনকে করেছে মহিমান্বিত। সে কারণে তাকে মহাউপাসিকা বিশাখাও বলা হয়। এছাড়া বৌদ্ধ থেরী সুমেধা ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। ধর্ম শিক্ষাদানে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। পার্থিব জীবনের ভোগ-বাসনা, মুক্তিমার্গ ও তার ফলপ্রাপ্তির সম্বন্ধে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার কবিতায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অপরিসীম দরদবোধের পরিচয় মেলে। থেরী সুমেধার লেখা কবিতায়ও তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন:

> অনিচ্চা অদ্ধুবা কামা বহুদুক্খামহাবিসা,
> অযোগুলো ব সন্তত্তো অঘমূলা দুক্খপ্ফলা।
> রুক্খপ্ফলূপমা কামা মংসপেসূপমা দুখা,
> সুপিনোপমা বঞ্চনিযা কামা যাচিতকূপমা।
> (বেলু রানী, ২০০৪ : ১৫৩)

অর্থাৎ,

> তৃষ্ণা অনিত্য, অধ্রুব, বহুদুঃখ ও তীব্র বিষ দুষ্ট;
> উহা উত্তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায়;
> উহা দুঃখমূল, দুঃখপ্রসূ।
> তৃষ্ণা বৃক্ষফলের ন্যায়, অশুভজনক
> মাংসপিণ্ডের ন্যায়; উহা স্বপ্নের ন্যায়
> প্রবঞ্চক; উহা ঋণরূপে গৃহীত পরধনের ন্যায়।
> (প্রজ্ঞালোক et al, অনূদিত, ২০১৮: ৫০৮-৫০৯)

পটাচারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন আশার আলো, মুক্তির পথ। বৌদ্ধ থেরীদের অগ্রগতির প্রতীক। সন্তানহারা শোকাগ্রস্ত মা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অবশিষ্ট জীবন ধর্মশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। বুদ্ধের দেশনায় পটাচারা পূর্ব স্মৃতি প্রাপ্ত হলেন, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, দিব্যসন্ধি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনেক নারী তাঁর কাছে ধর্মবাণী শ্রবণ করে বিমুক্তি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। নিজ সফলতার উল্লাসে তিনি বলে উঠলেন, অনন্তর সূচী নিয়ে দীপ-বর্তিকা নিচে টেনে তেলে নিমজ্জিত করলাম-দীপের নির্বাণ হলো! আমার চিত্তও দীপের ন্যায় মুক্ত হলো (শীলভদ্র, ১৩৫৭: ৬৯)। পৃথিবীতে একার সুখের মধ্যে প্রকৃত কোনো সুখ নেই, কারণ এ সুখ স্বার্থপরতার সুখ। নিজেকে আলোতে রেখে অন্য সবাইকে অন্ধকারে রেখে কোনো সুখ বা আনন্দ পাওয়া যাবে না। বরং সকলের সঙ্গে আলোর ভাগটা ভাগ করে নিতে পারার মধ্যেই রয়েছে যথাযথ আনন্দ। সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব ও সহমর্মিতার মধ্যে রয়েছে সুখ। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি যদি সহৃদয় হই তবেই পাওয়া যাবে আসল সুখ। যারা মহৎ ও পরোপকারী যারা সত্যিকারের গুণবান তারা নিজের কথা চিন্তা না করে, নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে পরের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আর যারা ক্ষণিকের সুখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তাদের উদ্দেশ্য সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের সত্যাভিজ্ঞতা ও সুন্দর লেখনী ছন্দময় ভাবধারায় বিমূর্ত হয়ে যেন সকল মানুষকে উপদেশ প্রদান করে,

> মহাদুঃখে জর্জরিত মানব জীবন,
> অবিদ্যা কারণে হয় দুঃখের সৃজন।
> জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, দুঃখ শৈশবের,
> মহাদুঃখ যৌবনের, দুঃখ বার্ধক্যের।

অপূর্ব বাসনা আর প্রিয়ের বিয়োগ,
নিদারুণ দুঃখময় অপ্রিয় সংযোগ ।
জরা-মরণের দুঃখ বড় ভয়াবহ,
অনির্বাণ চলে এই দুঃখের প্রবাহ (শীলালঙ্কার, ১৩৯৭: ৯১-৯২)।

এখানে ব্যক্তি মানুষের সুখ-দুঃখের দৈনন্দিন জীবন এবং ধর্ম জীবনের আস্বাদ ও পুনর্জন্মের নানাদিক উপস্থাপন করেছেন। ভোগ তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে যে ত্যাগ মহিমান্বিত মানবজীবন সে কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কেননা প্রবৃত্তির শৃঙ্খল মোচনের মাধ্যমেই মানুষের আত্মমুক্তি ঘটে। আর এ আত্মমুক্তির মাধ্যমেই পাওয়া যায় জীবনের আস্বাদ। পরবর্তীতে পটাচারা তাঁর মতো শোকাগ্রস্ত আরো ত্রিশজন নারীকে দুঃখ দূর করার জন্য ধর্মশিক্ষা দান করে বিমুক্তির পথে পরিচালিত করেছিলেন। ত্রিশজন ভিক্ষুণী অন্তদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণপূর্বক অর্হত্ব লাভ করেন। পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানুষের যেমন অভাবের শেষ নেই, তেমনি চাহিদারও অন্ত নেই। এখানে জীব জীবনের সুখের পরিকল্পনা ঐন্দ্রজালিকের মায়া উদ্যানের মতো। পৃথিবীতে যেকোনো কঠিন কাজকে জয় করতে হলে, যেকোনো কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সফল করতে হলে কষ্ট করতে হবে। সে সাথে পরিশ্রম করতে হবে দুঃখ-যন্ত্রণাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। জীবনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য, জীবনকে অর্থময় ও মহৎ করার জন্য দুঃখ কষ্টের স্পর্শ লাভ করতে হয়। ভদ্রা কুণ্ডলকেশা অনেক বুদ্ধিমতী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। উপস্থিত বাকচাতুর্য সম্পন্ন একজন ভালো তার্কিক ছিলেন। তিনি যখন সংসার ত্যাগ করে নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তারপর নিগ্রন্থদের ধর্মমত অধিগত করে তাদের সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্বক তিনি পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞানবুদ্ধি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। তর্কে সারিপুত্র ব্যতীত অন্য কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। এছাড়াও ভদ্রার কৌশল ও দক্ষতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় এক দেবতা। ভদ্রার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সর্বক্ষেত্রেই মানুষ নারীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়; নারীও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। নারীও চতুর, সে চিন্তা করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় (প্রজ্ঞালোক et al, অনূদিত, ২০১৮: ৪৩৬-৪৩৭)।'

বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে মানুষ কোনোকালেই পিছিয়ে ছিল না। শিল্প ও বিপ্লবের জয়যাত্রা বুদ্ধপূর্ব যুগ থেকেই ছিল। তবে বুদ্ধোত্তর যুগে অধিক বিস্তৃতি লাভ ঘটে। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে করেছে বিস্তৃত। আর এই বিজ্ঞানের ঐন্দ্রিজালিক শক্তি বলে মানুষ উদ্দাম। মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। কেননা বিজ্ঞান মানুষের সংকট নিবারণের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বহু অভাবনীয় কৌশল আবিষ্কার করেছে। আমাদের জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। থেরীগাথা গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, ব্রাহ্মণদের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা করে নিগ্রন্থদের সংঘে প্রবেশপূর্বক ভদ্রা কুণ্ডলকেশার মত বাগ্মিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন (বেলু রানী, ২০০৪: ৭৪)। বৌদ্ধধর্মে নারীর চেষ্টা সাধনা ও কর্ম তৎপরতা শুধু জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং তার কর্ম তৎপরতার ব্যাপক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাই সে জ্ঞান ও সাহিত্যের জগতে যেমন অগ্রসর হতে পারে তেমনি শিল্প ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধির অধিকার রাখে। তাই বলা যায় বুদ্ধের সময় থেকেই নারীরা মানবিক মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের অধিকার পেয়েছিল।

> In ancient times like men women were also educated in many subjects belonging to 'the sixty-four arts' Following are the subjects in which women used to acquire more education: These formed a stock list, which included not only music, dancing and singing, but also acting, the composition of poetry, impromptu and otherwise, flower-arrangement and garland-making, the preparation of perfumes and cosmetics, cooking, dress-making and embroidery,

> sorcery, conjuring andsleight of hand, the cpmposition of riddles, tongue-twisters and other puzzles, fancing with sword and staff, archery, gymnastics, carpentry and architecture, logic, chemistry and mineralogy, gardening, training fighting cocks, partridges and rams, teaching parrots and mynaha to talk, writing in cipher, languages, making artificial flowers and clay modelling (Basham, 1986: 184-185).

উপর্যুক্ত বিবরণী থেকে জানা যায় থেরী গাথা গ্রন্থে থেরী বিমলা, অঢ়্ডকাসী ও অম্বপালী তিনজনই বিপুল সম্পদের অধিকারী উচ্চশ্রেণির বারবিলাসিনী নারী ছিলেন। এই তিনজন নারীই যে চৌষট্টি কলাবিদ্যার অন্তর্গত সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক নানা বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। নিজ নিজ সাধনার দ্বারাই তারা সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখড়ে আরোহণ করতে সমর্থ হোন। এছাড়াও বুদ্ধই নারী সমাজকে শিক্ষা ও আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র নারী সমাজে তাই আজও বিশ্বের নারী সমাজ জাগ্রত।

৬.৩. '*দীপবংস*' গ্রন্থে বৌদ্ধ নারীদের শিক্ষা

বংস সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হলো *দীপবংস*। সিংহলের অনুরাধাপুরের উচ্চশিক্ষিত অনেক বৌদ্ধভিক্ষুণী বিনয়, অভিধর্ম ও সূত্রপিটকের অন্তর্গত বহু গ্রন্থের অধ্যাপনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অনুরাধাপুরের অন্যতম বিনয় বিশারদ ছিলেন সম্রাট অশোক কন্যা সংঘমিত্রা। তিনি ত্রিবিদ্যায়[১] পারদর্শী ছিলেন। যথা: পূর্বনিবাসানু স্মৃতি, পরচিত্ত-বিভাজন জ্ঞান ও আস্রব ক্ষয়জ্ঞান। এছাড়া তিনি যাদুবিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন। থেরী সংঘমিত্রার[২] মতো থেরী অঞ্জলি বিনয়পিটকের পাঁচখানি ও অভিধর্ম পিটকের সাতখানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করতেন। থেরী সংঘমিত্রার নিকট রানী অনুলা তাঁর পাঁচশত সঙ্গিনীসহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন (দীপংকর, ২০০৩: ১৭১)। আরো উল্লেখিত আছে, থেরী অঞ্জলি ষোল হাজার ভিক্ষণীসহ অনুরাধাপুরে গমন করেছিলেন। এছাড়াও মহাপ্রজ্ঞাবতী ও বিচক্ষণা হেমা, মসগল্লা ও অগ্নিমিত্তা, তপ্পা, পব্বতচিন্না, মল্লা এবং ধম্মদাসীয়া এরূপ অনেক ভিক্ষুণী রাগহীন, সমাহিত যাদের ছিল পবিত্র মানসিক সংকল্প, ধর্ম ও বিনয়ে যাদের ছিল অত্যন্ত আনন্দ। তারা সবাই ছিলেন ক্ষীণাশ্রব, ইন্দ্রিয় সংযত, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন (দীপংকর, ২০০৩: ১৮৫-১৮৬)। এছাড়াও বহু প্রতিভাময়ী নারী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুবলা, সোনা, নন্দা, উত্তরা, ফেগ্গু, গিরিদ্ধী, সোভনা, কুটিকণ্ণা, মহাতিস্যা, ধন্না, নাগমিত্তা ও পণ্ডিতা মহাকালী তারা সকলেই বিনয়ে পারদর্শী, বহুশ্রুতা, ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষক এবং ভিক্ষুণী সংঘের অলংকার ছিলেন। বুদ্ধের সময়ে আপন সাধনায় ত্যাগ ও তিতিক্ষায় মহিয়সী নারী রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোনো বন্ধনই তাদের সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। অনেক নারী নিজের চরিত্রের স্বরূপ বুঝতে পেরে মন্দ দিক পরিহার করে সুপথে এসেছেন। তাই নিজেদের ভিক্ষুণী সংঘে উৎসর্গ করে নির্বাণের দীপশিখাকে জীবনে প্রজ্বলিত করেছেন।

৬.৪. '*মহাবংশ*' গ্রন্থে নারী শিক্ষা

বৌদ্ধ '*মহাবংশ*' গ্রন্থটি সিংহলের (শ্রীলংকা) ইতিহাস নিয়ে রচিত একটি গ্রন্থ। এখানে সরাসরি নারী শিক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা খুব বেশি পরিলক্ষিত না হলেও এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক ইতিহাস ও সংঘের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, গৌতম বুদ্ধের বাণীতে নারীরাও জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তবে একথা ঠিক যে প্রথমদিকে নারীদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করা কঠিন ছিল। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে শুরুর দিকে নারীদের জন্য সংঘে প্রবেশ করা কঠিন হলেও মহাপ্রজাপতি গৌতমী প্রথম নারী হিসেবে সংঘে প্রবেশ করেন। এটির ফলে প্রমাণ হয় যে নারীরাও আধ্যাত্মিক জ্ঞান

অর্জন করতে সক্ষম। সম্রাট অশোক তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে কন্যা সংঘামিত্রাকে প্রব্রজ্যা দিয়ে বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। মহাপ্রজ্ঞাবতী, ত্রিপিটক পারদর্শী সংঘামিত্রা বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য বোধিবৃক্ষের শাখা নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন। এছাড়াও সংঘামিত্রার কাছে রাণী অনুলাদেবী পাঁচশত স্ত্রীলোকসহ প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। '*মহাবংশ*' গ্রন্থটি সরাসরি নারী শিক্ষা ওপর আলোকপাত না করলেও, পরোক্ষভাবে এটি বৌদ্ধধর্মের প্রসারে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। এছাড়া এটি প্রমাণ করে যে নারীরা জ্ঞানার্জনের অধিকারী ছিলেন।

৬.৫. '*শাসনবংস*' গ্রন্থে নারী শিক্ষা

ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমার) অরিমর্দন নগরের নারীরাও যে শিক্ষিত ছিলেন তা উল্লেখ করা হয়েছে পালি সাহিত্যের অন্তর্গত '*শাসনবংশ*' নামক গ্রন্থে। কিংবদন্তি আছে, অতি আগ্রহের সাথে নারীরা গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা হলে কে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন তা নিয়ে আলোচনা হতো। অরিমর্দন নগরের নারীরা ব্যাকরণ সম্পর্কেও অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- অরিমর্দন নগরের মাতৃজাতিরাও সদ্দনীতি বা ব্যাকরণ শাস্ত্রে অতি দক্ষ এই কথার সত্যতা পরীক্ষার্থে রতনপুর নিবাসী এক শ্রমণ যখন অরিমর্দন নগরের দিকে যাচ্ছিলেন তখন পথপার্শ্বস্থ এক কার্পাসক্ষেত্র পাহারারত এক বালিকা উক্ত শ্রমণটিকে তিনি কোন জায়গা থেকে আগমন করেছেন। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় শ্রমণটি 'উত্তমপুরুষ' শব্দ যোগের পরিবর্তে 'প্রথমপুরুষ' শব্দযুক্ত বাক্যে বালিকাটির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এতে উত্তরদাতার ব্যাকরণ জ্ঞানের স্বল্পতা বুঝে বালিকাটি শ্রমণের বাক্যের ব্যাকরণগত ভুল সংশোধন করে দিয়েছিল। ফলে সাধারণ একজন বালিকার ব্যাকরণ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে লজ্জিত হয়ে শ্রমণটি অরিমর্দন নগরের মাতৃজাতির ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করার ইচ্ছা ত্যাগ করে সেই স্থান থেকেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন (ধর্মাধার, ১৯৬২: ১০৯-১১০)।

৬.৬. '*মিলিন্দ প্রশ্ন*' গ্রন্থে নারী শিক্ষা

'*মিলিন্দ প্রঞ্হ*' বা '*মিলিন্দ প্রশ্ন*'। ত্রিপিটক বহির্ভূত একটি প্রাচীন বৌদ্ধধর্মমূলক গ্রন্থ। এতে বৌদ্ধ দর্শনের জটিল তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ও নানা যুক্তি উপমার মাধ্যমে সেগুলো সহজ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রিক রাজা মিলিন্দ ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপকথন এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কুশল-অকুশল কর্ম বুঝতে সহায়তা করে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের জীবনে হিরণ্ময় দ্যুতিতে ভাস্বর এক অনন্য মানবীয় গুণ। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই শিক্ষাকে যথার্থভাবে হৃদঙ্গম করতে পারলে যে সত্য জ্ঞান লাভ হয়, সেই সত্য জ্ঞানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি জগতের যেকোনো অসম্ভব কার্যকে আপন ইচ্ছাশক্তি বলে সম্ভব করতে পারেন। এছাড়াও মানুষকে সাফল্যের সোনালি পথের নিদের্শনা দেয়। যারা সংকল্পে অটল, জীবন যাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের কাছে অসাধ্য কিছুই নেই। যেমন মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে, বিন্দুমতী একজন গণিকা ছিলেন। তিনি সত্যজ্ঞানের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা বিন্দুমতীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে গঙ্গার স্রোতবিপরীত মুখে প্রবাহিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বলেছিলেন, আমি সেই নারী। আমার সত্য বলের এতো প্রভাব যে, তা দ্বারা আমি সকল কিছুসহ এই মহাপৃথিবীকেও উল্টিয়ে দিতে পারি (সাধনকমল, ২০০১: ১২২)।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক প্রাচীন মহাবিহার। তবে এই সককল প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য

পাওয়া বেশ কঠিন হলেও কিছু প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে এই সকল প্রতিষ্ঠাগুলোতে নারীদের উপস্থিতি ছিল। তবে শিক্ষা মূলত ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও কলাবিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটি অন্দরমহলেও সীমিত পরিসরে পরিচালিত হত। ঔপনিবেশিক যুগে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। যার ফলে নারী শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। তবে একথা সত্য যে, প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেই সময়ে নারী শিক্ষার সুযোগ সীমিত হলেও এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৬.৭. ‘*প্রেতবত্থু*’ গ্রন্থে নারী শিক্ষা

‘*প্রেতবত্থু*’ গ্রন্থটি ত্রিপিটকের সুত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ। এটি মূলত ‘প্রেতদের জীবন’ নিয়ে লেখা একটি গ্রন্থ। যেখানে মূলত মৃতদের অতৃপ্ত ইচ্ছা ও কর্মের ফলস্বরূপ তাদের প্রেত জীবন প্রাপ্তির গল্প বর্ণিত হয়েছে। যদিও গ্রন্থটিতে সরাসরি নারী শিক্ষা সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত আলোচনা নেই। তবে এখানেও প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী নারীরাও জ্ঞানার্জন করতে পারেন। এছাড়া তারাও বৌদ্ধসংঘে প্রবেশের অধিকার রাখেন। তবে এখানে একথাটিও বলে রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হলো ‘*প্রেতবত্থু*’ গ্রন্থে মূলত অতৃপ্ত আত্মা ও তাদের কর্মফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে সেখানে নারী শিক্ষার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। বৌদ্ধধর্ম মতানুসারে, নারীরা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকারী। বুদ্ধের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল সবাই যেন জ্ঞান লাভ করতে পারে কিন্তু এমন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য ছিল না। মহাপ্রজাপতি গৌতমী ছিলেন বুদ্ধের বিমাতা এবং বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের প্রথম নারী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৌদ্ধধর্মে নারীদেরও সংঘে যোগ দিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

৬.৮. ‘*অপদান*’ (*থেরী অপদান*) গ্রন্থে নারী শিক্ষা

‘*অপদান*’ বা ‘*থেরী অপদান*’ গ্রন্থ দুটি বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। তবে এই গ্রন্থগুলোতে সরাসরি নারী শিক্ষা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো আলোচনা নেই। বরং এই গ্রন্থগুলো ‘*থেরীগাথা*’র অংশ। যেখানে বুদ্ধের সময়ে ভিক্ষুণী (থেরী) এবং ভিক্ষুদের (থের) আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে নারীদের জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেটি তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন ঘটায়। এখানে নারী শিক্ষা বলতে মূলত বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান, ধর্মীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। যেটি তাদের আত্মিক মুক্তির পথে সহায়ক ছিল বলা যায়। সুতরাং, উক্ত গ্রন্থগুলো সরাসরি নারী শিক্ষার পাঠ্যক্রম বা সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা না করলেও এটি বৌদ্ধধর্মে নারীদের জ্ঞানচর্চা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে।

৬.৯. ‘*ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ*’ গ্রন্থে নারী শিক্ষা

‘*ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ*’ এর অংশ হিসেবে থাকা ‘*থেরীগাথা*’ গ্রন্থে ভিক্ষুণীদের শিক্ষা লাভের সুযোগ, জ্ঞান অর্জন এবং উচ্চতর বৌদ্ধ শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে কিছু প্রারম্ভিক ও উচ্চশিক্ষিত ভিক্ষুণীর উল্লেখ আছে, যারা জ্ঞান অর্জন করে ধর্মচর্চাও রচনা করেছেন। যদিও এটি সমাজের সাধারণ নারী শিক্ষার থেকে ভিন্ন ছিল এবং বুদ্ধের নির্দেশনায় এর সূচনা হয়েছিল। ভিক্ষুণীরা

কেবল ব্রত গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং জ্ঞান অর্জন ও উচ্চতর ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। যেটি তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে। আবার অনেক ভিক্ষুণী ধর্মচর্চার পাশাপাশি নিজেরা সংগীত ও কবিতা রচনা করেছেন এবং সেগুলো '*থেরীগাথা*' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আবার কিছু ভিক্ষুণী সমাজসেবার কাজেও যুক্ত ছিলেন এবং অসুস্থ ও অনাথ সেবা করাকে নিজেদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও বৌদ্ধধর্মে নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ ছিল এবং এটি সাধারণ সমাজের নারী শিক্ষার থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। আবার নারীদের জন্য বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ এবং ধর্মীয় উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করা তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.১০. '*উদান*' গ্রন্থে নারী শিক্ষা

'*উদান*' একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ। যেখানে মূলত আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় উপদেশের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ ও মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কিত অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু '*উদান*' একটি ধর্মীয় ও দার্শনিক গ্রন্থ, তাই এতে সরাসরি নারী শিক্ষা নিয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা নেই। প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম ও প্রথা ছিল। আধুনিককালে নারী শিক্ষার প্রচলন ও বিকাশে জ্যোতিবা ফুলে ও সাবিত্রীবাঈ ফুলে এর মতো সমাজ সংস্কার করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিক্ষা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সাহায্য করে এবং সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এখানে বলা যেতে পারে যে, '*উদান*' গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্মের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় সেই সময়ের সমাজে নারী শিক্ষার ধারণা কিছুটা ভিন্ন ছিল।

৭. শিক্ষায় নারীর সাফল্য

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভাবিত অগ্রগতির ফলেই ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। পৃথিবী সত্যিই এখন হাতের মুঠোয়। মানুষ এখন অনেক এগিয়ে গেছে। গৌতম বুদ্ধ নারী শিক্ষার যে আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন তা আজও বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরিত ও বিকশিত রূপ। চিন্তা-চেতনায় ধ্যান ধারনায় নারী এক অনন্য আসন জুড়ে আছে। এছাড়াও দৃশ্যমান হয়েছে দেশের উন্নয়নে নারীর অবদান। মেয়েরা যে এখন আর পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সবর উপস্থিতি। দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ দেশের উন্নয়নকে করেছে তরান্বিত। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থাও কাজ করে যাচ্ছে নারীর উন্নয়নে। কেননা একটা সময় নারী অনেক পিছিয়ে ছিল শিক্ষার অভাবে। নারীরা যুগে যুগে কালে কালে নির্যাতিত, অবহেলিত এবং সামাজিক বাধানিষেধের বেড়াজালে বন্দী ছিল। কিন্তু বুদ্ধযুগ থেকে শুরু করে মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া নারীদের অন্ধকার জগত থেকে আলোর জগতে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বেগম রোকেয়া এ দেশের নারী জাতির মুক্তির অগ্রদূত। তিনিই ছিলেন একমাত্র নারী যিনি নারী মুক্তির ও কল্যাণের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা, সংগ্রাম ও স্বপ্ন সবকিছুই ছিল নারীদের জন্য নিবেদিত। তার প্রচেষ্টার সফলতা তিনি দেখে যেতে পারেননি। আজ নারীদের অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। দেশের সর্বক্ষেত্রে নারীর সবর উপস্থিতি পরিবার, সমাজ ও দেশের অর্থনীতি বদলে দিয়েছে। দক্ষতার সাথে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে যাচ্ছেন। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন নারীরা। কালান্তরে সেই ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। এসডিজি (SDG) এর সময়পর্ব ২০১৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১৭টি গোলের মধ্যে অন্যতম একটি গোল হলো মানসম্মত শিক্ষা। এই মানসম্মত শিক্ষা সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লক্ষ্য পূরণের পথেই

রয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি (SDG) সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার নতুন মাত্রা যুক্ত করবে। আর এই জন্যই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অর্ধেক জনসংখ্যা নারীকে পেছনে রাখার সুযোগ নেই। শিক্ষিত নারীর পক্ষেই সম্ভব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে শিক্ষিত করে একটি নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ উপহার দেওয়া। নারীর নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি, তার জীবন ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ছিলেন একজন কীর্তিমান বৌদ্ধ নারী। এরপর থেকে বিশ্ব অনেক নারী রাষ্ট্রপ্রধান দেখেছে। নারীদের জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন শ্রীমাভো বন্দরনায়েক। বিশ্ব দেখেছিলো তার বিচক্ষণতা ও ক্ষমতা। রাজা প্রসেনজিতের রানী উব্বরী বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৌদ্ধধর্মেই নিজেকে প্রকাশিত ও আলোকিত করেন।

টেকসই উন্নয়নে মানসম্মত নারীদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সক্রিয় অবদান রাখতে পারে। তারা যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জীবন পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। উন্নত ও আদর্শ জাতি গঠনে নারীদের অবশ্যই পুরুষের সমমান শিক্ষা দিতে হবে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের নারীদের সাফল্য সবার দৃষ্টি কেড়েছে। নারী বিজ্ঞানী ড. ফেরদৌসি কাদরি ২২তম ল'রিয়েল-ইউনেস্কো ফর ওমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়, যার দরুণ নারীরা বিভিন্ন পেশায় ও জাতি গঠনে অবদান রাখছে। পরিশ্রম, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তারা যোগ্যতা অর্জন করেছেন। নারীদের সফলতা আজ প্রশংসনীয়। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীদের বিশ্বব্যাপী আজ বিচরণ।

বুদ্ধই প্রথম নারীর শিক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতার লক্ষ্যে ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা নারী অধিকার সংরক্ষণে অনন্য সৃষ্টি। বাংলাদেশেও ভিক্ষুসংঘের পাশাপাশি ভিক্ষুণীসংঘ রয়েছে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশের একমাত্র ভিক্ষুণী সংঘারাম ও ধ্যানচর্চার কেন্দ্র রয়েছে। নারীরা তাদের অধিকার, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, সংগঠন, সভা-সম্মেলনের মাধ্যমে দাবী তুলে ধরেন। নারী কেন্দ্রিক সংগঠন হলো বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ (মহিলা), বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-উইমেন্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কে (পাহাড় ও সমতল), পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ। নারী সংগঠনগুলোর ইতিবাচক ভূমিকার ফলে জীবন ও জীবিকার নানাস্তরে নারীরা এগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের নারীদের আদর্শিক পথ দেখিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া, বেগম সুফিয়া কামাল, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। এছাড়াও নারী শিক্ষা প্রসারে বাঙালি বৌদ্ধ নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন−চারুবালা বড়ুয়া, ভাষাকন্যা প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ড. সুনন্দা বড়ুয়া, অধ্যক্ষ প্রীতিকণা বড়ুয়া, সুনীতি বড়ুয়া প্রমুখ।

৮. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বৌদ্ধযুগে প্রাচীন ভারতের নারীগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা স্বীকৃত। প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে নারী শিক্ষা, কর্মাবদান এবং জ্ঞান-দক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে পালি সাহিত্য গ্রন্থেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়ে নারী শিক্ষা-দীক্ষায় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুরুষের মতো তারাও এগিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের সমাজ জীবনে নারীরা অশ্রদ্ধার কারণ ছিলেন না। কেনোনা ভিক্ষুণীসংঘ ছিলো উপমহাদেশের নারী বিপ্লবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এই সংঘই ছিলো তাদের শিক্ষা তথা সংস্কৃতির দ্বার স্বরূপ। ভিক্ষুণীরা সংসার জীবন তথা সমাজ হতে নির্লিপ্ত থাকতেন বটে কিন্তু তাদের সংস্পর্শে গৃহী নারীরা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি

পেতেন। '*থেরীগাথা*' গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে, অনেক নারীই ধর্ম-দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। যেমন কুণ্ডলকেশী জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি অঙ্গ, মগধ, বৃজি, কাশি, কোশল প্রভৃতি জায়গা ধর্মদেশনার্থে পরিভ্রমণ করেন এবং নারী সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখেন। এভাবে তিনি পঞ্চাশ বছর বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে সদ্ধর্মসেবায় রত ছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যই বৌদ্ধধর্ম তথা শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত ছিলো। একই ধারাবাহিকতা বর্তমান পৃথিবীতে সক্রিয়ভাবে চলমান রয়েছে তার প্রমাণ সর্বত্র পরিলক্ষিত।

টীকা

১. ত্রিবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকারকেই ত্রিবিদ্যা বলা হয়। সেই তিনটি বিদ্যা হলো। যথা: ১. পূর্ব পূর্ব জন্মের অবস্থান সম্বন্ধে সর্ববিষয়ে জানার জ্ঞান; ২. সত্ত্বগণের মধ্যে কে কোথায় মরছে, কে কোথায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে এবং তার অদৃষ্ট কেমন হচ্ছে বা হবে ইত্যাদি জানার জ্ঞান। ৩. দুঃখের মূলহেতু দর্শন, সেটি দর্শন করে সেটি হতে মুক্তিলাভের উপায় দর্শন অর্থাৎ আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ দর্শনের জ্ঞান।

২. সম্রাট অশোকের কন্যা ও মহেন্দ্রের ভগিনী। অগ্নিব্রহ্মা তাঁর স্বামী। তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষের শাখা বহন করে সিংহলে নিয়ে যান। সেখানে অনুলাসহ বহু পুরনারীকে সদ্ধর্মে দীক্ষা দেন।

উল্লেখপঞ্জি

মেত্তা বংশ ভিক্ষু [অনূদিত] (২০০৩)। *খুদ্দকপাঠো*, বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।

ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (১৯৯৭)। *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। *জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। *জাতক, তৃতীয় খণ্ড*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ [অনূদিত] (১৪১৯ বঙ্গাব্দ)। *জাতক, প্রথম খণ্ড*, কালকাতা: করুণা প্রকাশনী।

প্রজ্ঞালোক স্থবির et al. [অনূদিত] (২০১৮)। *পবিত্র ত্রিপিটক (দ্বাদশ খণ্ড), খুদ্দকনিকায়ে থেরগাথা, থেরীগাথা, বুদ্ধবংশ ও চরিয়াপিটক*, বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি।

শীলভদ্র ভিক্ষু [প্রণীত] (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। *থেরী গাথা*, কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি।

ড. সুকোমল বড়ুয়া (১৯৯৮)। *কোসল ও মার সংযুক্ত*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯৯৮)। *বুদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নারী*, কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

বেলু রানী বড়ুয়া (২০০৪)। *থেরীগাথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ।

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া ও সুমঙ্গল বড়ুয়া [অনূদিত] (২০০৩)। *দীপবংশ*, চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি।

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির [বঙ্গানুবাদ] (১৯৬২)। *শাসনবংস*, কলিকাতা।

সাধনকমল চৌধুরী [অনূদিত] (২০০১)। *মিলিন্দ পঞ্হ*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী।

Basham, A. L. (1986). *The wonder that was India*, New Delhi: Rupa Co.

Internet

Napoleon Bonaparte, *http://bani.com.bd/226/2718/*